আনদ্ধ বা বিতত-বাদ্য—

'আনদ্ধ' শব্দের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ হলো—আ 'নহ্' ধাতু + 'ক্ত' প্রত্যয়। 'আ' এই উপসর্গের অর্থ 'পর্যন্ত', 'নহ্' ধাতুর অর্থ **'বন্ধন'**। অর্থাৎ যে বাদ্যযন্ত্রটি আগাগোড়া বন্ধনযুক্ত বা বাঁধা আছে, তাকেই আনদ্ধ বাদ্য বলে। তবলা, পাখোয়াজ, মৃদঙ্গ ঢোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রগুলির ছট্ দেখলেই তা বোঝা যায়।

'বিতত' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাই—বি+তন্+ক্ত। 'তন্' শব্দের বহু অর্থ আছে, তার মধ্যে একটি হলো **'আচ্ছাদন'**[১]। সুতরাং 'বিতত' শব্দের অর্থ এখানে হবে বিশেষভাবে আচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র।

বর্তমানে **অবনদ্ধ বা আনদ্ধ** বা **বিতত** বাদ্য বলতে বোঝায় চর্মাচ্ছাদিত তালবাদ্য।

আনদ্ধ বাদ্যের শ্রেণী—বৈদিক যুগের আনদ্ধ বাদ্য ছিল **দুন্দুভি**। দুন্দুভি হচ্ছে, এক-মুখযুক্ত বড় আকারের আনদ্ধ বাদ্য। অনুমান হয়, দেখতে অনেকটা বড় মাপের বাঁয়া তবলার মতো। বেদে ৩ রকম দুন্দুভির উল্লেখ আছে—ভূমি-দুন্দুভি, দেব-দুন্দুভি ও বনস্পতি। বেদে কোথাও এদের আকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা নেই। বহু পরবর্তীকালে বেদাঙ্গ গ্রন্থাদিতে যে-কথা বলা আছে, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট সংশয় আছে। আমার ধারণা ভূমি-দুন্দুভির অবয়ব ছিল মাটির। কারণ 'ভূমি'-র একটি অর্থ হলো 'মৃত্তিকা'। 'বনস্পতি'-র অবয়ব বড় গাছের গুঁড়ি কুঁদে তৈরী হতো। বনস্পতির অর্থ বড় গাছ। দেব-দুন্দুভির কথা বলা যাচ্ছে না। তবে ৩ প্রকার দুন্দুভির মুখ চর্ম দ্বারা যে আচ্ছাদিত থাকতো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

পরবর্তীকালে ভারতে আনদ্ধ বাদ্যের যে বিবর্তন দেখা যায়, তা কিন্তু ঐ মৃৎ-অঙ্গের এবং কাষ্ঠাঙ্গের দুন্দুভি অর্থাৎ ভূমি-দুন্দুভি ও বনস্পতিকে অবলম্বন করেই হয়েছিল। আজও দেখা যায় আনদ্ধ বাদ্যের দেহটি হয় মাটির তৈরী, নয়তো কাঠের। তবে একমুখযুক্ত বাদ্য কবে এবং কিভাবে যে দু'মুখ হলো, তা বলা দুঃসাধ্য। দুন্দুভি জাতীয় বাদ্যকে পরবর্তীকালে ভাণ্ডবাদ্য বলা হতো। **'ভাণ্ড'** শব্দের অর্থ 'পাত্র'। চল্‌তি কথায় আমরা বলি ভাঁড়।

আনদ্ধ বাদ্যের মুখ ঢাকা হতো বাছুর বা ছাগলের চামড়া দিয়ে। পরবর্তী-কালে আমরা দেখতে পাচ্ছি, **'পুষ্কর'** নামক এক প্রকার তাল বাদ্যের উদ্ভব। সঙ্গীত-শাস্ত্রে 'পুষ্কর'-কে ভাণ্ডশ্রেণীর আনদ্ধ-বাদ্য বলা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রে ভরতমুনি 'পুষ্কর'-বাদ্যের আবিষ্কারক হিসেবে স্বাতিমুনির নাম বলেছেন। তিনি

এ বিষয়ে একটি গল্পেরও অবতারণা করছেন। গল্পটি এই রকম—কোনো এক ছুটির দিনে (অনধ্যায়ে) স্বাতিমুনি জল আনতে নিকটবর্তী এক পুষ্করিণীতে গিয়েছিলেন। আকাশ ছিল ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। প্রবল বেগে বৃষ্টি এলো। পুষ্করিণীর পদ্মপত্রে ছোট-বড় বৃষ্টি ফোঁটা পড়ার জন্য নানা রকম শব্দ হতে লাগলো। স্বাতি সেই শব্দগুলিকে স্মরণে রেখে আশ্রমে ফিরে আসেন এবং বিশ্বকর্মাকে ডেকে এমন এক আনদ্ধ বাদ্য সৃষ্টি করতে বললেন যাতে ঐশব্দগুলিকে প্রকাশ করা যেতে পারে। বিশ্বকর্মা তখন দেবতাদের দুন্দুভি অনুসরণ করে **'মুরজ'** বাদ্যের সৃষ্টি করেন। পরে পণব, দর্দুর ইত্যাদি বাদ্যও সৃষ্টি করেছিলেন বিশ্বকর্মা। এই জাতীয় সমস্ত বাদ্যগুলিকে একত্রে **পুষ্কর-বাদ্য** বলা হতো। অনেকে ভরতের লেখা শ্লোক থেকে অনুমান করেন, পুষ্করিণীতে পদ্মপাতার ওপর বৃষ্টিপাতের শব্দ শুনে এ জাতীয় বাদ্যগুলি সৃষ্টি হয়েছিল বলেই এদের নাম হয়েছিল **'পুষ্কর'**। কিন্তু **শতপথ ব্রাহ্মণ** গ্রন্থ পড়লে দেখা যাবে সেখানে লেখা আছে—**'পূষ্কর'** শব্দই পুষ্কর শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। পূষ্কর = পূঃ + কর। **'পূঃ'** শব্দের অর্থ 'শক্ত আচ্ছাদন'। 'কর্' মানে করা। সুতরাং পূষ্কর > পুষ্কর কথার মানে দাঁড়ালো শক্ত আচ্ছাদনযুক্ত বাদ্যযন্ত্র।

প্রাচীনকালে পুষ্কর বাদ্য দু'প্রকারের ছিল—মৃৎ-অঙ্গের ও কাষ্ঠ-অঙ্গের। প্রাচীন গ্রন্থাদি পড়লে বোঝা যায় যে, মৃদঙ্গ বাদ্যটি স্বাতি মুনির বহু আগেই ছিল। স্বাতি কেবল মৃদঙ্গের রূপ পরিবর্তন করে **'মুরজ'** সৃষ্টি করেছিলেন। মুরজ-এর তিনটি ভেদ ছিল—**উর্দ্ধক, আলিঙ্গ্য** এবং **অঙ্কিকা**। মুরজ জাতীয় বাদ্য প্রাচীন নাটকের বৃন্দ-বাদ্যে ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীকালে প্রাচীন গান্ধর্ব নাটক যখন লোপ পেলো তখন 'মুরজ' শব্দটির ব্যবহারও লুপ্ত হলো। কিন্তু 'মৃদঙ্গ' শব্দটি প্রচলিত ছিল। কারণ মাটির অবয়ব-যুক্ত সকল বাদ্যই 'মৃদঙ্গ' নামে পরিচিত ছিল। পরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ব্যবহার্য মৃদঙ্গকেই 'মৃদঙ্গ' বলা হতে থাকল। অন্যগুলি **প্রত্যঙ্গ** বা অপ্রধান শ্রেণীর বাদ্য হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হতে লাগল। মুরজের তিন প্রকারের মধ্যে **'অঙ্কিকা'** দু'মুখযুক্ত বাদ্য, কোলে রেখে বাজাতে হতো। 'অঙ্ক' মানে কোল। উর্দ্ধক ও আলিঙ্গ্য ছিল একমুখযুক্ত।

ভরতমুনির সময়ে (খৃঃ পূঃ ২০০) ব্যবহারের গুরুত্ব অনুসারে আনদ্ধ বাদ্য-গুলিকে ২ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল—অঙ্গ ও প্রতঙ্গ। 'অঙ্গ' ছিল প্রধান এবং 'প্রতঙ্গ' ছিল অপ্রধান বা সহযোগী বাদ্য। ভরতমুনির কালে মৃদঙ্গ, দর্দুর (দর্দর) ও পণব বাদ্যকে 'অঙ্গ' বলা হতো এবং ঝল্লরী, পটহ ইত্যাদি বাদ্যকে 'প্রতঙ্গ' বলা হতো। (আনদ্ধ বাদ্যের বিভিন্ন প্রকারগুলির সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের স্বল্প-পরিসর স্থানে তা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমান গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছে আছে)। পরবর্তীকালে মৃদঙ্গ কাঠ দিয়ে তৈরী হতো।

মধ্যযুগে মুসলিম সঙ্গীতগুণীগণ 'মৃদঙ্গ' শব্দের বদলে পারসিক শব্দ 'আওয়াজ' শব্দটি ব্যবহার করত। পররর্তীকালে মুসলিম সঙ্গীতের প্রভাবে ঠাট-তত্ত্বে বিশ্বাসী সঙ্গীতজ্ঞগণও ঐ শব্দটি ব্যবহার করতে থাকেন। শুধু এইটেই নয় বহু ভারতীয় সঙ্গীতের পরিভাষার পারসিক নামকরণ হয় ঐ সময়ে। অবশ্যই প্রকৃত অর্থ না বুঝে।

সঙ্গীতোপনিষৎসার (১৪০৬ খৃঃ) গ্রন্থে[১] লেখা আছে যে, সাধারণ লোকে খন্দাউজ, পখাউজ ও পট্টাউজ-কে 'আউজ' বলে। খন্দাউজ হচ্ছে 'স্কন্ধাওয়াজ' যা কাঁধে ঝুলিয়ে বাজানো হতো। 'পট্টাউজ' দক্ষিণ ভারতে গিয়ে 'অড্ডাওয়াজ' হয়ে যায়। উত্তর-ভারতের পট্ট=দক্ষিণ ভারতের অড্ড। 'পুষ্কর' শব্দটিকে বিদেশী মুসলিমগণ 'পুখ্‌র্' উচ্চারণ করতেন। কালক্রমে পুখ্‌র্>পুখ্>পখ্ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে 'পখাউজ' বা 'পাখোয়াজ' শব্দের উৎপত্তি হয়। প্রখ্যাত সঙ্গীত-শাস্ত্রী শ্রদ্ধেয় ডাঃ বিমল রায় সর্বপ্রথম বলেন যে, "এটা ভাবা স্বাভাবিক যে পখা-উজ-ও কিছুকাল আগে অন্য কোন শব্দ ছিল। খুব সম্ভব, শব্দটি—পুষ্করাওয়জ। 'পুষ্কর' লোকভাষায় পুখ্‌খর্ বা পুখর্। এই পুখর্+আওয়জ থেকে পুখরাওয়জ —পুখাওয়জ—পখাওয়জ—পখাউজ হতে খুব বেশী সময় লাগবার কথা নয়।"[২]

সঙ্গীতোপনিষৎসার গ্রন্থ পড়লে বোঝা যায় যে ১৪শ-১৫শ খৃষ্টীয় শতকে ঢোল, তবলা ইত্যাদি ছিল ম্লেচ্ছদের বাদ্য। 'ম্লেচ্ছবাদ্যানি ঢোল্লতবলমুখানি তু।' (২য় অধ্যায়, শ্লোক ৯৩)।

যাইহোক্, বর্তমানে আনদ্ধ বাদ্যগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়—(ক) শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উপযোগী, (খ) লঘু-সঙ্গীতের উপযোগী এবং (গ) পল্লী-সঙ্গীতের উপযোগী।

শাস্ত্রীর সঙ্গীতের উপযোগী বাদ্য হলো—পাখোয়াজ, মৃদঙ্গ, খোল ও তবলা। লঘু-সঙ্গীতের প্রয়োজনে যে-কোনো বাদ্যই লাগতে পারে। তবে তবলাই অধিক ব্যবহৃত হয়। পল্লীসঙ্গীতে সাধারণতঃ ঢোল, ঢাক জাতীয় বাদ্যই বেশী ব্যবহার করা হয়।

সুষির-বাদ্য—'সুষির' শব্দটির শুদ্ধ বানান হলো '**শুষির**'। 'শুষ্' শব্দের অর্থ হলো ছিদ্র। কাজেই সুষির-বাদ্যের অর্থ হচ্ছে, যে বাদ্যযন্ত্রের ছিদ্র থেকে স্বর উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ ফুঁ-এর বা হাওয়ার বাজনাগুলিকেই সুষির-বাদ্য বলে। নানারকম বাঁশি এবং হারমোনিয়াম জাতীয় বাদ্যযন্ত্রগুলি হলো সুষির বাদ্যের উদাহরণ।

ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্র অনুযায়ী সুষির-বাদ্যের চারটি ভেদ আছে—(ক) বংশী (খ) কাহলা, (গ) শৃঙ্গ এবং (ঘ) শঙ্খ।

(ক) বংশ বা বাঁশ থেকে উৎপন্ন নল-আকৃতির শুষির-বাদ্যকেই '**বংশী**' বলে। তবে প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে, বাঁশ ছাড়াও খয়ের-কাঠ, হাতির-দাঁত, চন্দন-কাঠ (সাদা বা লাল), লোহা, কাঁসা, রুপো, এমনকি সোনা দিয়েও বাঁশি তৈরী হতো। বংশীর দণ্ডটির ভিতর ফাঁপা এবং উপরিভাগে একই লাইনে অনেকগুলি ছিদ্র থাকে। তাদের মধ্যে প্রথম ছিদ্রটিকে বলে '**মুখরন্ধ্র**' বা '**ফুৎকার-রন্ধ্র**' বলে। বাকী ছিদ্রগুলিকে বলে 'স্বর-রন্ধ্র'। বংশীতে ৬টি স্বর-রন্ধ্র থাকে। বর্তমানে প্রচলিত বংশী বা বাঁশির প্রধানতঃ ৩টি প্রকার দেখা যায়—(ক) সোজা বাঁশি, (খ) আড় বাঁশি বা মুরলী এবং (গ) বেণু বা টিপারা ফ্লুট।

সোজা বাঁশির মাথায় ফুৎকার-রন্ধ্র থাকে, সেটি চ্যাপ্টা আকৃতির। আড়-বাঁশির ফুৎকার-রন্ধ্রটি বাঁশির গায়ে স্বর-রন্ধ্রগুলির কিছু দূরে থাকে। টিপারা-ফ্লুটের আলাদা কোনো ফুৎকার-রন্ধ্র নেই। বাঁশির মাথায় বিশেষ কায়দায় ফুঁ দিতে হয়। ভারতবর্ষের নানাস্থানে বংশীর আরো নানা প্রকার আছে। তবে সেগুলি

রাগ-সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয় না।

(খ) **কাহলা** বা কাহল বাদ্য হচ্ছে ধুত্‌রো ফুলের আকৃতির মত। শানাই জাতীয় ছোট-বড়ো যে-কোনো বাঁশি কাহল বাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। 'নাই' শব্দটির পারসিক ভাষায় অর্থ হলো 'বাঁশি'। কাহলা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বাঁশিগুলির সবচেয়ে সরু প্রান্তে একজোড়া **'রীড'** বা জিভ থাকে। এইটি হচ্ছে এ জাতীয় বাঁশির ফুৎকার রন্ধ্র। বংশীর মতই কাহলা জাতীয় বাঁশিগুলির গায়ে স্বর-রন্ধ্র থাকে।

(গ) 'শৃঙ্গ'-কে চল্‌তি কথায় আমরা শিঙ্গা বলি। সাধারণতঃ মোষের শিং দিয়ে শৃঙ্গ জাতীয় বাঁশি প্রাচীনকালে তৈরী হতো। পরবর্তীকালে ধাতু-নির্মিত এ জাতীয় বাঁশি তৈরী হয়। পাশ্চাত্য দেশগুলি শৃঙ্গ-জাতীয় বাঁশির বহুপ্রকার ভেদ তৈরী করেছে। বিউগ্‌ল্‌ জাতীয় বাদ্যগুলি তারই প্রমাণ। পাশ্চাত্য শৃঙ্গতে একাধিক স্বর বাজে। আমাদের দেশের রণ-শৃঙ্গ, গো-শৃঙ্গ, রাম-শৃঙ্গ ইত্যাদি বাঁশিতে একটি বা দু'টির বেশী স্বর উৎপন্ন হয় না। এগুলি সাধারণতঃ মন্দিরে বা রাজ-দরবারে অনুষ্ঠানের ঘোষণা-কার্যে ব্যবহৃত হতো।

ঘ) **'শঙ্খ'** জাতীয় শুষির বাদ্যকে চল্‌তি বাংলায় শাঁখ বলা হয়। শঙ্খের দেহটি কঠিন চূণ-জাতীয় পদার্থে তৈরী। শঙ্খ একজাতীয় শামূকের বহিরঙ্গ বা খোলা। শঙ্খের মুখটি ফুটো করে বাজাবার উপযোগী করে নিতে হয়। এতে একটি মাত্র স্বর প্রবলভাবে বাজে। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে, যুদ্ধ-ঘোষণায়, সকল শুভ কার্যে এবং শত্রু বা প্রাকৃতিক বিপদের কথা প্রতিবেশীকে জানাবার জন্য শঙ্খ-ধ্বনি করা হতো। আজও তাই করা হয়। শঙ্খের নানা প্রকার আছে, যেমন—পঞ্চমুখী শঙ্খ, পাণিশঙ্খ, গৌরীশঙ্খ, ধবল-শঙ্খ ইত্যাদি।